আজকের আধুনিক নারী সহিষ্ণু ও সচেতন, পরিশ্রমী ও প্রকাশময়ী। সঙ্কটকে সে অতিক্রম করার প্রয়াসী। বিবিধ সম্পর্কের প্রতি সে আন্তরিক; ঘরে-বাইরে স্বাচ্ছন্দ্য। নারী প্রসঙ্গে এ নিয়মিত আয়োজনে থাকছে তারই কিছু সঙ্কেত ও সুঘ্রাণ...

বীরাঙ্গনাদের শেষ দিনগুলো

● কেকা অধিকারী

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধকালে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্য এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদর সদস্যদের দ্বারা নারীদের ওপর যেসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তা ছিল রোমহর্ষক, বীভৎস ও পৈশাচিক। নির্যাতিত নারীর সংখ্যা আড়াই থেকে সাড়ে চার লাখ হবে। যুদ্ধশেষে এসব নির্যাতিত নারীর জীবন নতুন করে নীরব নির্যাতনের শিকার হয়। সেটাই ছিল তাদের জন্য সবচেয়ে বড় মনোবেদনার। পরিবার ও প্রিয়জনদের কাছে বহু নারী হন পরিত্যক্ত। বহুজন বেছে নেন আত্মহননের পথ। মুখে মুখে তাদের ত্যাগ স্বীকারের কথা স্বীকার করে নেয়া হলেও সমাজে তাদের সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার টেকসই উদ্যোগ কখনই নেয়া হয়নি। তৎকালীন সরকার কর্তৃক 'বীরাঙ্গনা' খেতাবটি অনেকের কাছেই অর্থহীন হয়ে পড়ে সামাজিক বাস্তবতায়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, স্বাধীনতার পর চারটি দশক কেটে গেলেও কোনো সরকারই তাদের যোগ্য সম্মান দেখাতে পারেনি। জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য লজ্জাকর। সেখানে সান্ত্বনা এটুকু যে, অবশেষে ৪৩ বছর পর স্বীকৃতি পেলেন একাত্তরের বীরাঙ্গনারা। সরকারিভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র এখন থেকে একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দেশীয় সহযোগীদের হাতে নির্যাতিত নারীদের মুক্তিযোদ্ধার সম্মান ও স্বীকৃতি দেবে। ছোট্ট একটি সিদ্ধান্ত, কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলার দায় কিছুটা হলেও এতে শোধ হলো। সম্প্রতি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সভায় একাত্তরের নির্যাতিত নারীদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এর মাধ্যমে প্রায় চার দশক বয়সী একটি জাতীয় দাবি পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হলো। সরকার ও মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় এ জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পেতে পারে।

বাড়ির দাওয়ায় মুক্তিযোদ্ধা তমিনা খাতুন

তবে বীরমাতা ও বীরাঙ্গনাদের কেবল মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিদানের সন্তুষ্টির ভেতরে আমাদের বাঁধা পড়ে থাকলে চলবে না। কী অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে যে কাটছে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী একাত্তরে নিপীড়ন-ধর্ষণের শিকার বিত্তহীন নারীদের জীবন, তার কিছুটা বিবরণ সম্প্রতি উঠে এসেছে এক নারী সাংবাদিকের পর্যবেক্ষণে। ইংল্যান্ড থেকে দেশে এসেছিলেন শাহমিকা আগুন, যিনি এককালে দৈনিক জনকণ্ঠে সাংবাদিকতা করতেন। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, 'গিয়েছিলাম শ্রীপুরে বীরাঙ্গনা মমতাজকে দেখতে। মমতাজ হলেন সেই বীরাঙ্গনা যাকে ন'মাসের গর্ভাবস্থায় আটজন পাকিস্তানি সৈন্য ধর্ষণ করেছে। তার সন্তানটির পৃথিবীর আলো দেখার ভাগ্য আর হয়নি। পেটের ভেতরে মায়ের জরায়ু আর পায়ুপথের সঙ্গে জড়িয়ে পেঁচিয়ে পচে-গলে সে বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গেছে। দেশে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। মৃত্যুপথযাত্রী মমতাজকে নদীপথে হাসপাতালে নিয়ে তিন মাস পর সেই মৃত শিশুর হাড়-গোড় বের করে আনা হয়। কিন্তু চিরদিনের জন্য অকেজো হয়ে যায় মমতাজের শরীরের পায়ুপথ এবং যোনিপথ। ডাক্তাররা তার তলপেট কেটে তার কোলনটিকে (পায়খানার রাস্তা) বের করে দেন এবং গত ৪৩ বছর এভাবেই মলত্যাগ করেন তিনি। সারা জীবনে ষোলোটি অপারেশন হয়েছে তার। তার কোলনটি ঢেকে রাখার জন্য কোলন ব্যাগ কেনার ক্ষমতা নেই। তাই পরনের ছেঁড়া ময়লা শাড়িটি দিয়ে তিনি তার কোলনটি ঢেকে রাখেন। ... আমরা অনেক উঁচু-নিচু রাস্তা পার হয়ে গেলাম বীরাঙ্গনা তমিনা খাতুনের বাড়িতে। কাছে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি খুব অসুস্থ। তার ডান পা-টি ভেঙে গেছে এক মাসের ওপরে। কোনো চিকিৎসা তো দূরে থাক, একটি প্যারাসিটামল ট্যাবলেটও কপালে জোটেনি ব্যথা কমার জন্য। আমি কী বলব কোনো ভাষা খুঁজে পেলাম না। দুদিনে একবার মেয়ে আসে খাবার নিয়ে। কারণ মেয়ে অনেক দূরে থাকে। আর তখনই সে মায়ের মল-মূত্র সব পরিষ্কার করে দেয়। আমরা যাওয়ার কিছু আগে মেয়ে এসেছিল। তাই আমরা পরিষ্কার জায়গায় বসতে পেরেছি। নয়তো তিনি খুব বিব্রত হতেন।'

মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী নারীদের মর্যাদার সঙ্গে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি নিশ্চয়ই আমরা তুলব। কিন্তু যারা এখনো বেঁচে আছেন, তাদের জীবনের শেষ দিনগুলো স্বস্তিময় করে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদেরও যে কিছু কর্তব্য আছে, সে বিষয়ে যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ■